Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.15-23
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ন্যায়সূত্র ও ভাষ্য অনুসারে অর্থ ও তত্ত্ব: একটি পর্য্যালোচনা

ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার
পি এইজ. ডি রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, মেমারি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Nyāya Philosophy is also known as pramāna-śastra. Pramāna means the instruments of right cognition. Vāṭsyāyana, a great commentator of Nyāya-sūtra, in the very beginning of his commentary represents that the instrument of right cognition can be used to establish the meaning of things (artha-pratipatti). And therefore, the instrument of right cognition must be meaningful (arthavāna). Right cognition (pramiṭi), cognised object (pramēya), and cognisor (pramāṭṛi or pramāṭā) also become meaningful as assistants of the instrument of right cognition. The meaningfulness of these four confirms the real nature of things (tattva). So, the real nature of things is depended on the meaning of things. In this paper, it is examined the relation between the real nature of things and the meaning of things in context of Nyāya-sūtra and Nyāya-sūtrabhāṣya.

Keyword: **Pramāna, Artha-pratipatti, Arthavāna, Pramiṭi, Pramēya, Pramāṭṛi, Tattva.**

ভূমিকা: ভারতীয় দর্শনাকাশে নবগ্রহের মতো যে নয়টি দর্শন সম্প্রদায় বিরাজমান, তাদের মধ্যে অন্যতম ও উজ্জ্বলতম হলো ন্যায় দর্শন সম্প্রদায় । এই ন্যায় দর্শনের বিশালতা ও গভীরতাকে বোঝাতে কৌটিল্য বলেছেন -

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্বকর্মাণাং।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা।।[1]

অর্থাৎ সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায়, সর্বধর্মের আশ্রয় রূপ আন্বীক্ষিকী মত বিবক্ষিত।

অর্থশাস্ত্রের এই আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীন কাল থেকেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বা ন্যায় দর্শন ভারতীয় দর্শনের আঙিনায় নিজ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে সুরভিমলিত পুষ্পের মতো বিরাজমান। সুরভি যেমন নিজের সুবাস বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার করতে সমর্থ্য হয় সেরূপ ন্যায় দর্শনও নিজের দার্শনিক তত্ত্বকে নিজের কর্মকুশলীর দ্বারা প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তার করতে সমর্থ্য হয়েছে এবং জোরালো যুক্তির প্রয়োগের দ্বারা নিজের বিস্তার অক্ষুণ্ণ রাখতেও সমর্থ্য হয়েছে। এভাবেই এই দর্শন হয়ে উঠেছে সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, যা অন্যান্য বিদ্যার সহায়ক হয়ে নিজ ঔজ্জ্বল্যে বিরাজমান। আমরা জানি যে শাস্ত্রে চারপ্রকার বিদ্যার কথা উল্লেখ আছে, সেগুলি হল - আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দন্ডনীতি, এই চারটি

বিদ্যার মধ্যে প্রথমটি হল আন্বীক্ষিকী, এটি বকি তিনটি বিদ্যার সহায়ক হয়েও নিজ গরিমা প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলকথা এই যে, এই বিদ্যা প্রদীপের ন্যায় নিজে যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনই অপরকেও নিজের প্রভা দ্বারা প্রকাশিত করেছে।

সর্বকর্মের উপায় রূপেও আন্বীক্ষিকী বা ন্যায় দর্শন তার মাহাত্ম বজায় রেখেছে। দৈন্দদিন জীবনে যে সকল কর্ম আমরা করে থাকি, বিশেষত শাস্ত্র আলোচনার ক্ষেত্রে, ন্যায় স্বীকৃত পদার্থগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ প্রমাণাদি ব্যতীত কখনই শাস্ত্র আলোচনা, এমনকি দৈন্দদিন জীবনের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ও অসম্ভব।

সকল ধর্মের আশ্রয় রূপেও ন্যায় শাস্ত্র নিজের গৌরব বর্ধিত করে তুলেছে। ভগবান্ মনুও বলেছেন যে, ধর্মতত্ত্ব-নিনির্ণীষু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্ররূপ শব্দ-প্রমাণের সঙ্গে অনুমান প্রমাণকেও সম্যক্ রূপে বুঝেছেন এবং তিনি আরও বলেন - যিনি বেদ ও শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্র-বিচার করেন, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে জানেন; আর যিনি ঐরূপ তর্কের দ্বারা শাস্ত্র বিচার করেন না, তিনি শাস্ত্রগম্য ধর্ম সম্বন্ধে জানতে পারেন না।[2] এখানে 'তর্ক' শব্দের দ্বারা তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্রের কথা বোঝানো হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, ধর্মকে যথাযথ জানতে হলেও তাকে হতে হয় ন্যায়নির্ভর। এভাবে ন্যায় শাস্ত্রকে আশ্রয় করে ধর্ম নিজের প্রকৃত স্বরূপ অন্যের কাছে প্রকাশ করতে সামর্থ্য হয়ে থাকে।

এই প্রকান্ড বৃক্ষস্বরূপ ন্যায়শাস্ত্রের যে মূল, সেই মূলটি অতিপ্রচীন একজন ঋষি দ্বারা গ্রথিত হয় – তিনি হলেন মহর্ষি গৌতম এবং পরবর্তী কালে এর যে পুষ্টতা, সেটিও এসেছে সেই মূলের নির্যাস থেকেই; এই মূলটি হল ন্যায় দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ "ন্যায়সূত্র" নামক সূত্রগ্রন্থ। এই ন্যায়সূত্র নামক মূলকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে যে অসংখ্য কান্ড-উপকান্ড, শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে তা অতি অল্প ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। এর মধ্যেই সর্বপ্রথম যিনি ঐ ন্যায়সূত্র রূপ মূল থেকে নির্গত অঙ্কুররূপ সূত্রধারাকে পরিচর্চার মাধ্যমে বর্ধিত করেছিলেন এবং সাধারণোপযোগী করে তুলেছেন, তিনি হলেন আরও এক মহান ঋষি, ঋষি বাৎস্যায়ন। মহর্ষি বাৎস্যায়ন হলেন ন্যায়সূত্রের প্রথম ও প্রচীন ভাষ্যকার। তাঁর ভাষ্য হল ন্যায়সূত্রভাষ্য বা বাৎস্যয়নভাষ্য । বাৎস্যায়নের নিজ মহিমায় ও স্বগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর ভাষ্যটি সকলের কাছে আকর্ষণী ও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এই ভাষ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হল তার নির্দিষ্ট গঠনশৈলী। মহর্ষি তাঁর ভাষ্যে সরাসরি সূত্রকারের সূত্রের ব্যাখ্যা করতে উদ্যত না হয়ে পূর্বে নিজমত আলোচনার প্রেক্ষিত ধরে সূত্রকারের মতকে উপস্থাপন করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ পূর্বক আলোচনা করেছেন। আবার প্রয়োজনে কোন কোন স্থানে সূত্রকারের মতের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন তুলেছেন ও তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; যার ফলে তাঁর ভাষ্য হয়ে উঠেছে এক অসামান্য সম্পদ, বিশেষত ন্যায়শাস্ত্র আলোচনার জগতে। সহজকথায়, বাৎস্যায়নভাষ্য নিজ সতন্ত্রতার জন্যই সর্বজনবিদিত।

এই ভাষ্যের সূচনাতেই আমরা দেখতে পাই যে ভাষ্যকার নিজমত প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে –

'প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ
প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।'[3]

অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি হয়; কারণ, প্রমাণের দ্বারা প্রবৃত্তি সাফল্য জন্মায়, এভাবে প্রমাণ দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি হওয়ায় প্রমাণও অর্থবৎ। এখানে ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য হল – প্রমাণের দ্বারাই অর্থের

প্রতিপত্তি হয়ে থাকে বা অর্থের প্রতিপত্তি হওয়া সম্ভব। প্রমাণের লক্ষণে ভাষ্যকার বলেন 'স (প্রমাতা) যেনার্থং প্রমাণোতি, তৎ প্রমাণং'[4] অর্থাৎ প্রমাতা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে, তাই প্রমাণ। প্রমাণের এই লক্ষণের বিশদার্থের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন 'যস্যেপ্সাজিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা'[5] অর্থাৎ প্রাপ্তির ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছা প্রযুক্ত বা কৃতজন্য যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, সেই পুরুষ বা জীব রূপ প্রমাতা যে প্রণালীর দ্বারা বা যে পদ্ধতির দ্বারা প্রমা বা যদর্থবিজ্ঞানম[6] বা যথার্থ জ্ঞান লাভ করে তাই প্রমাণ। এই আলোচনা প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার'কে অনুসরণ করে বলা যায় – 'প্রমাণ' পদটি 'প্রমীয়তেনেন' এই বিগ্রহে প্র'পূর্বক জ্ঞানবাচী মা'ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'প্র' শব্দের অর্থ 'প্রকর্ষ'। 'প্রকর্ষ' হলো 'তদ্বতি তৎপ্রকারকত্ব'[7] । অতএব, সেইপ্রকারবিশিষ্ট পদার্থে – তৎপ্রকারকত্বই প্রকর্ষ। অর্থাৎ কোনো জ্ঞান যদি এমন হয়, ঐ জ্ঞানটি যে পদার্থ বিষয়ক, সেই পদার্থ যে প্রকার হয়, সেই প্রকারক পদার্থই জ্ঞানে ভাসিত হয়, তাহলে ঐ জ্ঞানটি প্রমা হবে অর্থাৎ জ্ঞানটিতে প্রকর্ষ আছে বুঝতে হবে। এইরূপ প্রমা বা প্রমিতি বা প্রকর্ষের করণ বা ব্যাপারবিশিষ্ট অসাধারণ কারণ'ই হলো প্রমাণ। এই প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জ্ঞানের ধরণ অনুযায়ী প্রমাণের ভিন্নতা স্বীকৃত। সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনে মূলত ছয়প্রকার প্রমাণের কথা পাওয়া যায়, যথা: প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি। তাছাড়াও বিভিন্ন দর্শনে আরো দুই প্রকার প্রমাণের কথা পাওয়া যায়, যথা: ঐতিহ্য ও চিহ্ন। অর্থাৎ এই সকল প্রমাণের দ্বারাই ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞান লাভ করে থাকে বলে মনে করা হয়। তবে ন্যায় মতে, চারটী প্রমাণের ওপর নির্ভর করেই কোন ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে, তার অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার অপ্রয়োজনীয় । তাঁরা বলেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটী প্রমাণের দ্বারাই আমরা সকল প্রকার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি। নৈয়ায়িকদের মতে, এই চারটী প্রমাণের দ্বারাই অর্থের প্রতিপত্তিও হয় বা অর্থের যথার্থতা বোধও জন্মায়। এখানে 'প্রতিপত্তি' শব্দের দ্বারা 'গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের বোধ' কে বোঝানো হয়েছে। এই গ্রাজ্যত্বের বোধ ও ত্যাজ্যত্বের বোধ থাকায় আমরা গ্রাহ্য বিষয়কে গ্রাহ্য রূপে এবং ত্যাজ্য বিষয়কে ত্যাজ্যরূপে জানতে পারি। 'গ্রাহ্য' বলতে এখানে গ্রহণীয় অর্থাৎ ব্যক্তির সময়ানুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। আবার 'ত্যাজ্য' বলতে এখানে বর্জনীয় অর্থাৎ ব্যক্তির সময়ানুযায়ী অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। আবার যা গ্রাহ্যও নয় এবং ত্যাজ্যও নয় তা উপেক্ষনীয় রূপে পরিচিত। তবে বস্তুর এই গ্রাহ্যতা, ত্যাজ্যতা ও উপেক্ষনীয়তা সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নয়। কেননা, কোন একটি বিষয়ই কোন এক সময় গ্রাহ্যরূপে, অন্য সময় ত্যাজ্যরূপে, আবার ভিন্ন সময় উপেক্ষনীয়রূপে চিহ্নিত হয়। এইরূপ গ্রাহ্য বিষয়কে গ্রাহ্য রূপে, ত্যাজ্য বিষয়কে ত্যাজ্য রূপে এবং উপেক্ষণীয় বিষয়কে উপেক্ষণীয় রূপে জানলে প্রবৃত্তি সাফল্য আসে। কারণ, গ্রাহ্য বিষয়কে গ্রাহ্যরূপে জেনে তা গ্রহণের জন্য ইচ্ছা জন্মায় এবং ত্যাজ্য বিষয়কে ত্যাজ্যরূপে জেনে তা বর্জনের নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মায় আবার উপেক্ষণীয় বিষয়কে উপেক্ষণীয়রূপে জেনে তাকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা জন্মায় - তার দ্বারা ব্যক্তি মানুষের যে সমীহা অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপার উৎপন্ন হয় – তা প্রবৃত্তি নামে কথিত হয় । এই প্রবৃত্তি যথাযথভাবে যদি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়কে গ্রাহ্যরূপে জেনে গ্রহণের ইচ্ছাবশত তাকে গ্রহণ করা হয়, ত্যাজ্য বিষয়কে ত্যাজ্যরূপে জেনে ত্যাগের ইচ্ছাবশত ত্যাগ করা হয় এবং উপেক্ষণীয় বিষয়কে উপেক্ষণীয়রূপে জেনে তাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে প্রবৃত্তি সাফল্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সর্পকে সর্প রূপে জেনে যদি বর্জনের ইচ্ছাবশত বর্জন করি তাহলে তা হবে সফলপ্রবৃত্তি। কিন্তু রজ্জুকে সর্পরূপে জেনে যদি বর্জনের ইচ্ছাবশত তাকে বর্জন করি তাহলে তা হবে বিফলপ্রবৃত্তি। এভাবে কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তিসামর্থ্য জন্মায় এবং

প্রমাণের সাথে অর্থের অব্যভিচারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। আর প্রমাণের সাথে অর্থের অব্যভিচারিত্ব থাকায় প্রমাণ নিজেই যে অর্থবৎ তা নির্ণীত হয়। অতএব, এখানে প্রমাণের অর্থবত্তা প্রতিষ্ঠাই ভাষ্যকারের মূল উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ভাষ্যকার প্রমাণের অর্থবত্তা প্রতিপাদন করতে প্রমাণের যে অর্থ প্রতিপত্তি করার সামর্থ্য আছে - সেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ভাষ্যকারের মতে, এই সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করেই প্রমাণের অর্থবত্তা নির্নীত হয়ে থাকে।

অর্থের স্বরূপ: সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনে 'অর্থ' শব্দটি বিভিন্নার্থক। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী মানুষের জীবনে যে চারটী বিষয় অতন্ত্য প্রয়োজনীয় সেগুলি 'পুরুষার্থ' নামে কথিত হয়। পুরুষের যা অর্থ বা কাম্য তাই পুরুষার্থ। মূলত এই ক্ষেত্রে 'অর্থ' বলতে প্রয়োজনীয়তা'কে বোঝানো হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারটী হল মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। আবার এই চারটীর মধ্যেই অন্যতম হল অর্থ, যা সরাসরি সম্পদ'কে নির্দেশ করে। তাই দেখা যাচ্ছে এক অর্থে 'অর্থ' পুরুষার্থ'কে ও অন্য অর্থে সম্পদ'কে নির্দেশ করা হয়েছে।

তবে মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে অর্থের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন - "অর্থস্তু সুখং সুখহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ"[৪] । অর্থাৎ অর্থ হলো সুখ অথবা সুখের কারণ এবং দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ। বিশদার্থে বলা যায় যে, সুখ ও দুঃখ নামক মানসিক গুণ বা অন্তঃবিষয় এবং ওই গুণের উৎপাদক অর্থাৎ কারণ সমূহ যে সকল বাহ্য বিষয় সেই সকল বিষয়ই অর্থ নামে কথিত। ব্যক্তিগণ যা কিছু সুখ ও সুখের কারণ, সেই সকলকে গ্রাহ্য হিসাবে বিবেচনা করে এবং যা কিছু দুঃখ ও দুঃখের কারণ, সেই সকলকে ত্যাজ্য বলে বিবেচনা করে। কারণ, ব্যক্তিগণ সর্বদাই সুখ ও সুখের কারণের প্রত্যাশী হয় আর যা দুঃখ ও দুঃখের কারণকে বর্জন করতে সচেষ্ট হয়। এভাবেই সুখ ও সুখের কারণ হিসাবে গ্রাহ্য বিষয়কে আবার দুঃখ ও দুঃখের কারণ হিসাবে ত্যাজ্য বিষয়কে ভাষ্যকার 'অর্থ' হিসেবে নির্দেশ করেছেন। মূলকথা এই যে, ন্যায় স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থই এখানে 'অর্থ' শব্দ দ্বারা নির্দেশিত। কারণ, পদার্থগুলিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সুখ অথবা সুখের হেতু এবং দুঃখ অথবা দুঃখের হেতু হয়ে থাকে। কেননা এই জগতের সকল বিষয়ই ওই পদার্থ দ্বারা যে নির্মিত - তা বৈশেষিকগণের মতো ন্যায়গণও স্বীকার করেছেন। তাই সেই পদার্থগুলিকেই সুখ ও সুখের হেতু অথবা দুঃখ ও দুঃখের হেতু গণ্য হয়ে থাকে।

তত্ত্বের স্বরূপ: প্রমাণে অর্থের প্রতিপত্তি করার ক্ষমতা থাকায় প্রমাণ নিজেও যে অব্যভিচারিত্ব সম্বন্ধে অর্থবান তা নির্ণয় করার পরক্ষণেই ভাষ্যকার বলেছেন - প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতে প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতিকেও অর্থের অব্যভিচারী বলে গণ্য করেছেন এবং পদার্থের অব্যভিচারীত্বের চারটী প্রকার দ্বারাই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিষয়গুলিকে ক্রমানুসারে সজালে তা এরূপ হয় -

১) প্রমাণের দ্বারা প্রবৃত্তি সাফল্য বা প্রবৃত্তি সামর্থ্য জন্মায়।
২) প্রমাণের প্রবৃত্তি সামর্থ্য থাকায় তা অর্থের প্রতিপত্তি ঘটাতে পারে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি সম্ভব হয়।
৩) প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি হওয়ায় তাও অব্যভিচারীরূপে অর্থবান হয়।
৪) প্রমাণ অর্থবান হওয়ায় প্রমাণের সহায়ক প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতিও অর্থবান তা নির্ণীত হয়।
৫) এই চারটীর অর্থবত্তা স্থাপিত হওয়ার দ্বারাই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অতএব, অর্থের সঙ্গে তত্ত্বের সম্বন্ধ স্বীকার আবশ্যক। যদি তা না করা হয় তাহলে প্রমাণ ইত্যাদির অর্থবত্তা নির্ণয়ের মাধ্যমে তত্ত্বের পরিসমাপ্তি সম্ভব হত না, কিন্তু তা হয়ে থাকে। তাই তাদের সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয়।

মহর্ষি বাৎসায়ন তাঁর ভাষ্যে তত্ত্বের নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন - তত্ত্ব হল "সতশ্চ সদ্ভাবোঽসতশ্চাসদ্ভাবঃ"[9] অর্থাৎ সৎ পদার্থের সদ্ভাব এবং অসৎ পদার্থের অসদ্ভাব। এখানে 'তস্য ভাবঃ' এই অর্থে 'তত্ত্ব' শব্দটি নিষ্পন্ন। এখানে 'তত্ত্ব' শব্দের অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের দ্বারা সৎ ও অসৎ পদার্থ বিবক্ষিত। এক্ষেত্রে 'সৎ' শব্দের দ্বারা ভাব পদার্থ নিদের্শিত অর্থাৎ যাকে আমরা 'আছে'এরূপ বলতে পারি। আবার 'অসৎ' শব্দের দ্বারা অভাব পদার্থ নির্দেশিত অর্থাৎ যাকে আমরা 'নেই' এরূপ বলতে পারি। 'নেই' বলতে এখানে এমন কিছুকে নির্দেশ করা হচ্ছে না যা কোন কালেই ছিল না বা কোনভাবেই থাকতে পারে না। অর্থাৎ অভাব দ্বারা কখনই অলীক বস্তুকে নির্দেশ করা হয় না। আবার পদার্থ মাত্রই তা প্রমাণ সিদ্ধ হতে হবে, যা প্রমাণ সিদ্ধ নয় তা পদার্থ হতে পারে না। আর অলীক যেহেতু কোন প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে না তাই অলীক বস্তু পদার্থ হতে পারে না। তাই অলীক বস্তু যে অভাব পদার্থ নয় সেকথা স্বীকারই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ এইদিক থেকে পদার্থকে দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়; ভাব ও অভাব। পদার্থ সকলের মধ্যে প্রমাণ যাকে ভাব বা 'অস্তি' বলে প্রতিপন্ন করে তা ভাব পদার্থ বলে কথিত হয় আর যা প্রমাণের দ্বারা অভাব বা 'নাস্তি' বলে প্রতিপন্ন হয় তা অভাব পদার্থ নামে কথিত হয়। যেমন; এখানে একটি টেবিল আছে। এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানতে পারি যে, টেবিলটি বর্তমানে অস্তিত্বশীল বা আছে। তাই টেবিল নামক বস্তুটি এখানে ভাব পদার্থ। আবার যখন বলা হয়, 'ঘরে টেবিলটি নেই'। সেক্ষেত্রে টেবিলাভাবে'র যে জ্ঞান, সেই 'টেবিলাভাব' এখানে অভাব পদার্থ। কারণ, এখানে প্রত্যক্ষে প্রমাণের মাধ্যমে আমরা টেবিলাভাবকে জানতে পারি। তাই এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, যা সৎ তাকে প্রমাণের দ্বারা সদ্ভাবে জানা আর যা অসৎ তাকে অসদ্ভাবে জানা - এই দুইপ্রকার জানার যে বিষয়বস্তু সৎ এর সদ্ভাব এবং অসৎ এর অসদ্ভাব - তাই এখানে তত্ত্ব। অতএব, টেবিলের অস্তিত্বের টেবিল অস্তিভাব এবং টেবিলের নাস্তিত্বের টেবিল নাস্তিভাবই এখানে তত্ত্ব বলে নির্দেশিত হয়েছে।

ন্যায় মতে, অর্থ ও তত্ত্বের সম্পর্ক: প্রমাণের অর্থ নির্ণয় সামর্থ্য লক্ষ্য করে তার মধ্যে যে তত্ত্ব নির্ণয় সামর্থ্য বিদ্যমান তা বোঝা যায়। কেননা, প্রমাণ অর্থের প্রতিপাদনের সাথে সাথে তত্ত্বের সমাপ্তি ঘটায়। কারণ,

১) প্রমাণের আছে অর্থের প্রতিপাদন ক্ষমতা,

২) সেই প্রতিপাদন ক্ষমতাই তার অর্থবত্তা প্রমাণ করে,

৩) যা তত্ত্বকে প্রতিপাদন করে থাকে।

অর্থাৎ এখানে প্রমাণের অর্থের প্রতিপাদন করার ক্ষমতা থাকার জন্যই তাতে তত্ত্বের প্রতিপাদন ক্ষমতা আছে তা স্বীকার করতে হয়। তাই এখন অর্থ এবং তত্ত্বের কিরূপ সম্পর্ক তা জানাও আবশ্যক।

এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে — অর্থ ও তত্ত্ব এই দুটি একই বিষয়কে নির্দেশ করবে অথবা এরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুটি পৃথক বিষয়কে নির্দেশ করবে। 'অর্থ' শব্দের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখেছি 'অর্থ' শব্দ দ্বারা ন্যায়গণ পদার্থকেই নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ 'অর্থ' শব্দ দ্বারা পদার্থই নির্দেশিত। আবার সূত্রকার যখন বলছেন "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"[10] আর ভাষ্যকার যেহেতু সূত্রকারে মতানুসারী এবং ভাষ্যকার এ বিষয়ে কোন প্রশ্নও তোলেননি তাই বলতেই হয় যে - ভাষ্যকার তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমেই যে

নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় তা অবশ্যই স্বীকার করেছেন। আর 'তত্ত্ব' বলতে ওই সূত্রের মধ্যেই বলা হয়েছে ষোড়শ পদার্থের কথা। সুতরাং ওই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানের মাধ্যমেই যে নিঃশ্রেয়স হয় তা ব্যাখ্যাত। তাই ওই ষোড়শ পদার্থ'ই তত্ত্ব শব্দের দ্বারা নির্দেশিত। তাই 'অর্থ' ও 'তত্ত্ব' দুটিই 'পদার্থ'এর নির্দেশক – তা বলতেই হয়। কিন্তু আবার ভাষ্যকার অর্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যখন বলেন – 'অর্থস্তু সুখং সুখহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ' আবার পরক্ষণেই তত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন – 'সতশ্চ সদ্ভাব অসতশ্চাসদ্ভাব' তখন মনে হয় যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েরই নির্দেশক। কারণ একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হতে পারে না।

অর্থ ও তত্ত্বের সম্পর্ক স্বীকারে সমস্যা: উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ ও তত্ত্ব উভয়েই একই বিষয়কে নির্দেশ করে। তাই আমরা বলতে পারি যে অর্থ ও তত্ত্ব অভিন্ন অর্থাৎ

অর্থ = তত্ত্ব
অতএব,
অর্থস্তু সুখং সুখহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ = সতশ্চ সদ্ভাব অসতশ্চাসদ্ভাব

কিন্তু এরূপ বলা হলে অপবর্গকে তত্ত্ব (অর্থ) বলা যাবে না। কারণ, অপবর্গ'এর লক্ষণ দিতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম বলেছেন যে – "তদ্ (দুঃখ) অত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ"[11]। অর্থাৎ তার (দুঃখের) সঙ্গে অত্যন্ত বিমুক্তিই অপবর্গ। বলা যায় যে, অপবর্গ বা মুক্তি অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্র থাকে না, কেবল যে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না তা নয়, কোন কালেই তা তাকে আর বাধিত করতে পারে না। কেবল দুঃখ নিবৃত্তি হলে, অত্যন্তিক নিবৃত্তি না হলে – প্রলয় কালে জীবের দুঃখের অবসান হলেও তা সর্বতভাবে অবসান হতে পারে না। কারণ, পরে পুনঃরায় সৃষ্টি হলে আবার জীবের দেহাদি পরিগ্রহ হয় ও পুনঃরায় নানা দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু অপবর্গ হলে জীবের আর জন্ম হয় না। সেক্ষেত্রে তার আর কখনও দুঃখভোগও হতে পারে না। জীবের প্রলয়কালীন সর্বদুঃখশূণ্যাবস্থার পর্য্যন্ত সীমা আছে। কিন্তু মোক্ষ অবস্থার কোন সীমা নেই। সুতরাং মোক্ষ হলে তার আর কখনও পুনরাবৃত্তি হয় না। শ্রুতিতেও বলা আছে – "ন চ পুনরাবর্ত্ততে"[12] ।

এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মোক্ষ কোন ভাবেই দুঃখযুক্ত হতে পারে না, সর্বদাই দুঃখহীন হবে। আর এক্ষত্রে সমস্যা হল – পূর্বেই বলা হয়েছে যে অর্থ ও তত্ত্ব একই বিষয়কে নির্দেশ করে তাই যা তত্ত্বের লক্ষণ হবে তাই অর্থের লক্ষণও হবে- এরূপ দাবি একেবারে অযথার্থ নয়। তাই অপবর্গ নামক বিষয়কে তত্ত্ব বা অর্থ যা'ই বলা হোক না কেন, তাকে সুখং সুখহেতুশ্চ ও দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ বলা যাবে না। কারণ, যা দুঃখহীন তা কখনও দুঃখ হতে পারে না আবার তা কখনও দুঃখের কারণও হতে পারে না। কেননা দুঃখের কারণ হতে হলে তাকে দুঃখের উৎপাদক হতে হবে, কিন্তু দুঃখহীন বিষয় থেকে কখনও দুঃখও উৎপন্ন হতে পারে না। আবার ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর যে একবিংশতি দুঃখের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল সুখ। অর্থাৎ সুখও একপ্রকার দুঃখ। তাই যা সর্বতভাবে দুঃখহীন তা সুখও হতে পারে না। আবার তা সুখের কারণও হতে পারে না কারণ, সুখ ও দুঃখের মধ্যে অবিনিভাব সম্বন্ধ[13] আছে। এই সম্বন্ধ থাকায় যা সুখের হেতু হবে তা দুঃখেরও হেতু হবে। কিন্তু যা দুঃখহীন তা কখনও দুঃখের হেতু হতে পারে না। ফলে সেটি কখনও সুখেরও হেতু হতে পারে না। অতএব, অপবর্গকে সুখও যেমন বলা যায় না, তেমনি সুখের হেতুও বলা যায় না আবার দুঃখও যেমন বলা যায় না তেমনি দুঃখেরও হেতুও বলা যায় না। আর অর্থ ও তত্ত্ব যদি একই বিষয়কে নির্দেশ করে তাহলে অপবর্গকে অর্থের লক্ষণ অনুযায়ী কখনই তত্ত্ব বলা যাবে না।

আবার যদি বলা হয় যে অর্থ ও তত্ত্ব দুটি ভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করে তাহলে সমস্যা হলো – প্রমাণের অর্থ নির্ণয়ের সামর্থ্য দেখে অথবা প্রমাণের অর্থবত্তা দেখে তত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হল কেন? কারণ, তত্ত্বের পরিসমাপ্তি তখনই সম্ভব হয় যখন তত্ত্ব নির্ণয় সম্ভব হয়। তাই বলতেই হয় যে, তত্ত্ব পরিসমাপ্তি ও তত্ত্বনির্ণয় হল অভিন্ন বা তত্ত্ব পরিসমাপ্তি = তত্ত্বনির্ণয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, অর্থ নির্ণয় সামর্থ্য দেখে তত্ত্বনির্ণয় সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা করা কিভাবে সম্ভবপর?

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে অর্থ ও তত্ত্ব একই বিষয়কে নির্দেশ করলে অপবর্গকে তত্ত্ব বলা যায় না। এই সমস্যার সমাধানে বলা যায় যে – অপবর্গকে যদি ভাষ্যকারের মতানুসারে নিত্যসুখবিশিষ্ট দুঃখমুক্ত অবস্থাকে বুঝি, সেক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকে না। কেননা মোক্ষকে অত্যন্তিক দুঃখশূণ্য অবস্থা বলতে যদি সুখাবস্থাকে বোঝা হয় তাহলেও তা সম্ভব নয়। কারণ, 'শ্লোকবার্ত্তিক'এ কুমারিল ভাট্ট বলেছেন – "সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গ এব ভবেদেষ পর্য্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ"[14]। অর্থাৎ মোক্ষ সুখভোগরূপ হলে তা স্বর্গের মতো ক্রমশ কোন না কোন কালে বিনষ্ট হবেই। সুতরাং মোক্ষ অভাবত্মক অর্থাৎ সর্বদুঃখের আত্যন্তিক অভাবকেই মোক্ষ বলতে হয়। এভাবে অপবর্গকে কেবল দুঃখমুক্ত অবস্থার বিপরীত সুখাবস্থা বলে বুঝলে চলবে না,তাকে সর্বদুঃখের অভাব স্বরূপ নিত্য সুখাবস্থা বলেই বুঝতে হবে। আবার ভাষ্যকারও অপর্গের ব্যাখ্যায় বলেছেন – "নিত্যং সুখমাত্মনো"[15]। বিশদার্থে বলতে পারা যায় যে, সর্বব্যাপী জীবাত্মাতে নিত্য মহৎপরিণামের ন্যায় যে নিত্যসুখ বিদ্যমান আছে, সংসারকালে তার অভিব্যক্তি বা অনুভূতি হয় না, কিন্তু মুক্তিকালে তার অভিব্যক্তি হয়। আবার ভাষ্যকারের পূর্বেও কোন কোন নৈয়ায়িক বলেছেন যেমন, কণাদের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, কিন্তু গৌতমের মতে নিত্যসুখের অনুভববিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তিঃ। আবার মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি নিরর্থক নয় – এই বিষয়ে অনুমান প্রমাণ বিদ্যমান। কারণ, উপদেশমাত্র ও প্রবৃত্তিমাত্রই যখন তা সুখলাভার্থ তখন মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তিও সুখলাভার্থ। সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় – তা অনুমান সিদ্ধ, নিঃপ্রমাণ নয়। তাই বলতেই হয় যে, নিত্যসুখবিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। এভাবে মোক্ষ নিত্যসুখ হওয়ায়, তা দুঃখের সাথে অবিনিভাব সম্বন্ধহীন সুখ হিসাবে গণ্য হয়। কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করলেই তার নিত্যত্বে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই তাকে সুখ বলতে কোন সমস্যা আর থাকছে না এবং সুখ হিসাবে তাকে অর্থ বলতেও কোন সমস্যা থাকছে না। আবার অপবর্গ যে তত্ত্ব – সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই অর্থ ও তত্ত্ব একই বিষয়কে নির্দেশ করলেও আর কোন সমস্যা থাকে না।

আবার, মহর্ষি তাদের পৃথক পৃথক লক্ষণ দেওয়ায় যে সমস্যাটি হয়েছিল তা যথার্থ নয়। কারণ, অর্থ ও তত্ত্বের পৃথক লক্ষণ থাকলেও তারা যেহেতু একই বিষয়কে নির্দেশ করে তাই তাতে আর কোন সমস্যা নেই। যে পদার্থ'কে সুখ ও সুখের হেতু অথবা দুঃখ ও দুঃখের হেতু হিসাবে অর্থ বলা হয়, আবার সেই পদার্থ'ই সতশ্চ সদ্ভাব ও অসতশ্চ অসদ্ভাব হিসাবে তত্ত্ব বলা হয় – তাতে কোন সমস্যা নেই। কারণ, যে পদার্থ সুখ বা সুখের হেতু হয় তাকে সদ্ভাবে না জানলে তা যে সুখ ও সুখের হেতু তা বলা যায় না। আবার যে দুঃখ বা দুঃখের হেতু হয় তাকে সদ্ভাবে না জানলে তা যে দুঃখ ও দুঃখের হেতু তা বলা যায় না। তাই প্রথম পর্যায়ে যা সুখ ও সুখের হেতু অথবা দুঃখ ও দুঃখের হেতু হিসাবে পদার্থ হয়, তাই পরে সৎ ভাবে জানার ক্ষেত্রে সদ্ভাব ও অসৎ ভাবে জানার ক্ষেত্রে অসদ্ভাব হিসাবে তত্ত্ব হয়। এই আলোচনা থেকে বলতেই হয়, অর্থ ও তত্ত্ব দুটি শব্দ একই বিষয়কে নির্দেশ করলেও তাদের নির্দেশ করার ধরণটি এক নয়। এই ধরণ অনুযায়ীই

এদের পৃথক লক্ষণ স্বীকৃত হয়ে থাকে। অতএব, অর্থ ও তত্ত্ব এই দুটি শব্দ একই বিষয় অর্থাৎ ন্যায়স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থেরই নির্দেশক।

---

[1] কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র

[2] ভগবানমনু, মনু-সংহিতা

[3] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ; ন্যায়দর্শন, (১ম খন্ড). কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ: সেপ্টেম্বর, ২০১৪. পৃ: ১

[4] তদেব. পৃ: ১১-১২

[5] তদেব. পৃ:১১

[6] তদেব. পৃ: ১২ যদর্থবিজ্ঞানম, সা প্রমিতিঃ। অর্থাৎ পদার্থ বিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তা প্রমিতি।

[7] ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ,(অনুবাদ: সেখ সাবীর আলি). ন্যায়সূত্রবৃত্তি. কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার: ৩রা জুলাই, ২০১৫.পৃ: ৫৬

[8] . তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. ন্যায়দর্শন,(১ম খন্ড). কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ: সেপ্টেম্বর, ২০১৪. পৃ: ১

[9] তদেব. পৃ: ১৪

[10] তদেব. পৃ: ১৯

[11] তদেব. পৃ: ২৩৩

[12] তদেব. পৃ: ২৩৪

[13] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. ন্যায়দর্শন, (চতুর্থ খন্ড). পৃ: ৩১০ সুখ, দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধশূণ্য সুখ নাই, সুখ মাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ, এই জন্য সুখকে দুঃখ বলা হয়েছে।

[14] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. ন্যায়দর্শন, (১ম খন্ড). কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ: সেপ্টেম্বর, ২০১৪. পৃ: ২৩৬

[15] তদেব. পৃ: ২৩৫

গ্রন্থপঞ্জী:

১. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. ন্যায়দর্শন, ১ম খন্ড. কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ: সেপ্টেম্বর, ২০১৪.

২. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. ন্যায়দর্শন, ৪র্থ খন্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ: ডিসেম্বর, ২০১৫.

৩. আলি, সেখ সাবির. ন্যায়সূত্রবৃত্তি. কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার: ৩রা জুলাই, ২০১৫.

৪. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ. ন্যায় পরিচয়. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ: নভেম্বর, ২০০৬.

৫. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার. প্রশস্তপাদের দর্শন. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ: অক্টোবর, ২০১২.

৬. Jha, Mahāmahopādhyāya Ganganath. The Nyāya-Sūṭras of Gauṭama (Vol-I). Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd: 2015

৭. Dasgupta, surendranath. A History of Indian Philosophy(1-5 volume). Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd: 1984

৮. Dutt, Manmatha Nath. The Garuda Purana. New Bharatiya Book Corporation: 2012

৯. Woodroffe, John. Sakti and Sakta. Uploaded by Vathathmaja: Archive.org, October 29,2015

১০. Jha, Ganganatha. Tattvasangraha of Shantaraksita. Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd: 1986

১১. Jha, Ganganatha. Manusmriti with the Commentary of Medhatithi.